মন্তাজ

সম্পাদক

সৌরভ মুখোপাধ্যায়

সূচিপত্র

উত্তরপুরুষ
পিয়া সরকার
৯

বীজ
দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য
২৫

পরীক্ষিত
মনীষ মুখোপাধ্যায়
৩৫

বলাই ঘোষের গাছ
দেবাঞ্জন মুখোপাধ্যায়
৪৭

পঞ্চম নিষাদ
নীলাঞ্জন মুখার্জী
৬৮

আড়াখাল
হামিরুদ্দিন মিদ্যা
১২১

তিন দারোগার কীর্তি
দেবাশিস গোস্বামী
১২৯

জ্ঞানবৃক্ষ
রাজা ভট্টাচার্য
১৬২

ক্রান্তিসম্ভব
কর্ণ শীল
১৬৮

ঘাতক
অরিজিৎ গাঙ্গুলি
২২৯

গির গুহায় সাতদিন
দেবশ্রী ভট্টাচার্য
২৪৬

আরোগ্য
সুদীপ্ত নস্কর
২৫৫

উত্তরপুরুষ

পিয়া সরকার

|১|

আকাশে লাল মেঘ জমলেই জঙ্গলে হুটোপাটি বাড়ে। লালচে লোমওয়ালা কাঠবিড়ালিগুলো এইসময় খুব গম্ভীর মুখে দৌড়োদৌড়ি করে। আকাশ যখন পরিষ্কার, তখন কোথায় তাদের দৌড়ঝাঁপ, কোথায় বড়ো-বড়ো গাছ বেয়ে ওঠানামা! সেই সময় তারা চুপটি করে চওড়া-চওড়া পাতার আড়ালে লুকিয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে দেখে। পাখিগুলো বরং চালাক, লাল মেঘে কখন বৃষ্টি নামবে ঠিক বুঝতে পারে। তখন যাকে দেখে, তাকেই সন্দেহ করে। গাছের ডাল বেয়ে একটা পিঁপড়ে ঘোরাফেরা করলেও, ঠোঁট বাড়িয়ে ধরবে না। পাখা দুটোকে জমাটি করে গায়ের সঙ্গে সাঁটিয়ে বাসায় বসে থাকে, মাঝে-মাঝে ঘাড় ঘুরিয়ে পরিস্থিতি মাপে। যেন মেঘলা দিনে কাজেকর্মে বেরোনোর আগে রেইনকোট পরা বাবুরা খুব উদ্‌বিগ্ন হয়ে আকাশ দেখছে। জগৎ দেখার সাধ আছে বিস্তর, কিন্তু মাথা ভেজানোর নেই।

উদ্‌বিগ্ন অবশ্য মোহনলালও হয়েছিল। গত দুই রাত ভালো করে ঘুম হয়নি তার। কাজটা শেষ না-হলে, আজও সেই সম্ভাবনা নেই। সত্তরের কোঠায় বয়স হলেও মোহনলালের কাঠামো দৃঢ়, তার চোখের জ্যোতিও অক্ষত। নিশি জাগরণে তার চেহারায় বিশেষ ছাপ পড়েনি, তবে উদ্‌বেগে মুখের বলিরেখাগুলো একটু গভীর হয়েছে।

যৌবনে মোহনলাল যে সুদর্শন ছিল, সে কথা বুঝতে অসুবিধা হয় না। সিংহের মতো উঁচু কপাল, রুপোলি রঙের একমাথা চুল, রোদে পোড়া ফুটিফাটা গাল, সব মিলিয়ে মোহনলাল নিজেই একটা দলিল। দলিল তার নিজস্ব অতীতের।

মোহনলাল পারধি, বস্তারের শিকারি, অতীত বা ভবিষ্যৎ বা বর্তমান যাই হোক না কেন, মোহনলাল জানে ওটাই তার একমাত্র পরিচয়। আজও সে জঙ্গলেই বসে ছিল, তবে বস্তারে নয়। বস্তার থেকে সাড়ে সাতশো কিলোমিটার দূরে অন্য এক অরণ্যের ঠিক মধ্যস্থলে। পিছনে পাহাড়, সামনে মেলঘাটের জঙ্গল। জঙ্গলের মধ্যে এই জায়গাটাতেই নদী এত চওড়া। শীতের সময় অবশ্য নদী থাকে না, শুকিয়ে ঝোরা হয়ে যায়। স্থানীয় লোকেরা বলে খোলা। এখন বর্ষাকালে, চিক্কলধারার ঝর্ণায় জোয়ার নেমেছে বলেই নদীতে টইটুম্বুর জল। জলের উপর চাঁদের আলো পড়ে জোনাকির মতো চমকায় অন্যদিন। আজ এতক্ষণ ধরে আকাশে মেঘ করে থাকায় সেটুকু আলোর খেলাও বন্ধ ছিল, যেন জলে কালো কালি ঢেলে দিয়েছে কেউ।

একটা পাথরের ঢিবির পিছনে মোহনলাল বসে ছিল। পাশের ঢিবিটার আড়ালে বসে ছিল তার ছেলে রঙ্গলাল। গত দুঘণ্টা ধরে এখানেই অপেক্ষা করছিল ওরা। বিকেল গড়িয়ে সন্ধে নেমেছে এখন। মোহন সামনের দিকে নজর রাখার ফাঁকে-ফাঁকে ছেলের দিকে তাকাচ্ছিল বারবার। এতক্ষণ অপেক্ষা করতে-করতে অধৈর্য হয়ে রঙ্গলাল ঘুমে ঢুলে পড়ছিল, মাঝে-মাঝে মশার কামড় খেয়ে জেগে উঠেই হাতপায়ে উৎপটাং থাপ্পড় চালিয়ে দিচ্ছিল। মোহন শাসাতে এখন চোখ টানটান করে বসেছে। যার জন্য ওদের অপেক্ষা, তার কান খুব খাড়া। বেচাল দেখলে এদিকে আর আসবেই না। পিছন ফিরে চলে যাবে।

তবে রঙ্গলাল আদৌ কতক্ষণ অপেক্ষা করতে পারবে, তা নিয়ে ধন্দ আছে

বীজ

দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য

।১।

"অরুন্ধতী? ও লা অরুন্ধতী? নাইতে যাবি তো?"

বড়দির গলা। অরুন্ধতীর এই বড়োননদটি বেশ গ্রাম্ভারি চেহারার মানুষ। সম্প্রতি ছেলে হয়ে আরও মোটাসোটা, গোলগাল হয়েছে। চৌধুরীপাড়ায় শ্বশুরবাড়ি।

"কী রে কানে খোল জমেছে? শুনতে পাস না?"

বড়দির গলাটা এইবার ঘরের ভেতর ঢুকে এসেছে। একচিলতে বারান্দা ঘরের বাইরে। তার ওপর উঠে এসে দরজা দিয়ে ঘরের ভেতর উঁকি মারছে। উনুনের তলায় পেতলের পাইপটা দিয়ে ফুঁ দিতে-দিতে অরুন্ধতীর চোখে ধোঁয়ার জলের সঙ্গে অন্য একটু জলও চলে এল। ছেলে হয়ে বড়দির শ্বশুরবাড়িতে প্রতাপ বেড়েছে। কাজের লোক রাখা হয়েছে একটা। তাকে এসব কাজকর্ম এখন খুব একটা করতেটরতে হয় না।

"দেখ-না বড়দি। হতচ্ছাড়া উনুন...", গলা ধরে এল অরুন্ধতীর। দেশের বাড়িতে কাঠের উনুনে দুটো কাঠিকুটো ফেললেই গনগনে আগুন ওঠে। আর এদেশের এই হতচ্ছাড়া কয়লা...।

অতসী এসে উঁকি মেরে উনুনটার দিকে একনজর চেয়েই ফিক করে হেসে ফেলল, "উফ। মরি-মরি। উনুনভর্তি কয়লা চাপিয়ে তলায় কাগজের নুড়ো জ্বেলেছেন। এভাবে সারাদিনে তোর উনুন ধরবে? দাদাটা যে কোত্থেকে এই গেঁয়ো ভূতটাকে...।"

"গেঁয়ো ভূত? আমাদের জলপাইগুড়ি তোমাদের এই দেনগাঁর চাইতে অনেক বড়ো শহর।" অরুন্ধতী মুখ নিচু করে রেখেই রাগে গরগর করে উঠল।

"হ্যাঁ, সে তো বটেই। বাড়ি তো বেণেপুর। জলপাইগুড়ি সদর ছাড়িয়ে বিশ মাইল। আমার মেজবোনের শ্বশুরবাড়ি, আমি জানি না? তার আবার শহরের গর্ব, হুঃ। নে এখন সর। আঠারো বছুরে মেয়ে, তাকে এখন উনোন ধরানো শেখাই। ঘুঁটে আছে ঘরে? ঘুঁটে? ওই দুখানা...।"

বলতে-বলতেই কথা থামিয়ে হাসিতে ভেঙে পড়েছে অরুন্ধতী, "ও দাদা, উঠে এসে দেখে যা, বউয়ের কী রূপ খুলেছে তোর!"

দ্বিজেন ধুতির ওপর পাঞ্জাবি গলাচ্ছিল। সাড়ে ছটায় ইস্কুল বসে যায়। সাইকেল মেরে যেতে আধঘন্টার ওপর সময় লাগবে। বাজে পৌনে ছ'টা। বোতাম আঁটতে-আঁটতেই বলে, "আবার কী হল?" আর সেই বলতে-বলতে বের হয়ে এসে অতসীর দু'হাতে ধরা অরুন্ধতীর মুখটা দেখে হঠাৎ হাসিতে ফেটে পড়ল সে। অতসীও হাহাহিহি করে হাসতে লেগেছে। তারপর উঠে গিয়ে বারান্দার দিকে ঝোলানো আয়নাটা এনে অরুন্ধতীর মুখের সামনে ধরে বলে, "মুখপুড়ি, মুখে কয়লার কালি মেখে হনুমানের মা হয়ে...।"

বড়ো ক্লান্ত লাগছিল অরুন্ধতীর। রাতে রুটি করা নিয়ে একচোট হয়ে গেছে দ্বিজেনের সঙ্গে। ত্যাড়াব্যাঁকা আধপোড়া রুটি পাতে নিয়ে বসে একবার শুধু বলেছিল, "রুটিটাও ভালো করে গড়তে পারোনি? সারাটা দিন খেটেখুটে ঘরে ফেরা। এখন তবে আমি...।"

কথাগুলো শুনে হঠাৎ তার গত ছ'মাসের একাকিত্ব, দেশের বাড়ির ওই বিস্তীর্ণ দুনিয়া ছেড়ে এসে শহর-বাজারের এই একচিলতে ভাড়ার ঘরে সংসার, হাজারো দায়িত্বের শেকল, তার সঙ্গে মানিয়ে নেবার লড়াই এই সবকিছুর নির্যাস হয়ে একরাশ তিক্ততা এসে ভর করেছিল অরুন্ধতীর গলায়।

"খেতে হবে না তোমায় আমার রুটি। চারবেলা ভাত খেয়ে মানুষ। জন্মে কখনও রুটি দেখেছি চোখে? রুটি খাবার শখ তো তেমন মেয়ে বিয়ে করে আনলেই পারতে! দেনগাঁয় মেয়ের অভাব ছিল?"

কথাগুলো বলতে-বলতেই কেন যে অমন চণ্ডাল রাগ চেপে বসল তার মাথায়! দ্বিজেনের সামনে থেকে থালাটা টান দিয়ে সরিয়ে এনে জল ঢেলে দিয়েছিল সে তাতে। তাদের দুজনেরই আর খাওয়া হয়নি তারপর।

পাশে শুয়ে অনেক রাত্রে দ্বিজেন তাকে নিজের দিকে টেনেছিল। অন্ধকারে কাছে এসে তার চুলে মুখ গুঁজে বলেছিল, "খিদে পেলে উঠে মুড়ি খেয়ে নাও দুটো।"

অরুন্ধতী কোনও জবাব দেয়নি। বুক জুড়ে তখন তার একটা অবাধ্য জেদ মাথা তুলছে। এ-মানুষের সঙ্গে এই অচেনা পুরীতে এমনভাবে ঘর করতে সে পারবে না।

ভোর-ভোর ঘুম ভেঙে আবার, পাশে শুয়ে অকাতরে ঘুমিয়ে থাকা মানুষটার দিকে চোখ রেখে মনটা ভিজে গিয়েছিল অরুন্ধতীর। আহা মুখটা শুকিয়ে গেছে রাত্তিরে না-খেয়ে। যদি ইস্কুলে বেরোবার আগে অন্তত দুটি ভাতে ভাত ফুটিয়ে দেয়া যায়, সেই আশায় অন্ধকার থাকতে উঠে এসে উনুনটা নিয়ে পড়েছিল সে। এমনিতে দ্বিজেনই

পরীক্ষিৎ

মনীষ মুখোপাধ্যায়

|১|

ভারতের এই জঙ্গলটায় ওদের দেখা গেছে। একসঙ্গে অনেকগুলোকে ধরতে পারলে একদম রাজা হয়ে যাওয়া যাবে! রাজা...।

আপাত নিরীহ প্রাণী হওয়া সত্ত্বেও ওদের দেখে একটু ভয়ই করে। ধূসর রঙের ওপর সাদা অথবা কালো-লাল ফুটকি-ফুটকি দাগবিশিষ্ট চেহারাটাই ওদের আরও ভয়ংকর করে তুলেছে। এখানে আসার আগে বীরেশদা বারবার বারণ করেছিল আমাকে, 'না, পিকে! করিস না ও-কাজ! ওই প্রাণীটার দিকে হাত বাড়াস না!'

কে শোনে কার কথা! রাজা হওয়ার নেশা একবার মাথায় ঢুকলে মানুষের বাহ্যিকজ্ঞান বলে কিছু থাকে না। চিন্তাশক্তি হ্রাস পেতে থাকে ধীরে-ধীরে। আমারও তাই হয়েছিল। চলে এসেছিলাম দলটার সঙ্গে। জানতাম পদে-পদে বিপদ আছে। তাও ওই যে, রাজা হওয়ার নেশা!

এখন এই জঙ্গলে দাঁড়িয়ে ভয় করছে আমার। মনে হচ্ছে, মৃত্যু কোন দিক থেকে এসে কখন আক্রমণ করবে তার কোনও ঠিক ঠিকানা নেই। দলের চারজন এরই মধ্যে মারা গেছে। গোপনীয়তা বজায় রাখতে ওদের এই জঙ্গলের মাটির নিচেই চাপা দিতে হয়েছে।

কেউ কোনও হদিশ দিয়েও মরতে পারেনি, এতটাই অতর্কিত! শুধু রবার্ট, একা রবার্ট মারা যাওয়ার আগে বলে যেতে পেরেছিল একটিমাত্র কথা।

তখন ওর ঠোঁটের কশ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছিল। ব্রহ্মতালুর কাছটা যেন কেউ ফাটিয়ে দুভাগ করে দিয়েছিল।

বিস্ফারিত চোখে, জড়ানো গলায় রবার্ট শুধু বলতে পেরেছিল, 'ইটস্ ডেঞ্জারাস... ওহহ, ডেঞ্জারাস...'

ব্যস, শেষ!

বাকি তিনজনকে তো আমরা মৃত অবস্থাতেই খুঁজে পেয়েছিলাম জঙ্গলের মধ্যে। কারও মৃত শরীরটা উলটো হয়ে গাছে ঝুলছিল, কেউ আবার গাছের তলায় চিত হয়ে পড়েছিল। এই আকস্মিক মৃত্যুগুলোই আমাদের মধ্যে প্রচণ্ড ভয়ের জন্ম দিয়েছে। মস্তিষ্কের প্রতিটা কোষে বারবার আঘাত করছে একটাই কথা—তাহলে কি ওই আপাত নিরীহ প্রাণীগুলোও শিকার করতে জানে!

এসেছিলাম সাতজনের একটা দল। এখন পড়ে আছি মাত্র তিনজন। আমি, জুবের আর ক্যাপ্টেন কাজামা। তিনজন তিন দেশের মানুষ। আমি—পিকে, ভারতীয়; জুবের বাংলাদেশের আর কাজামা ইন্দোনেশিয়ার নাগরিক।

|২|

হন্যে হয়ে কাজ খুঁজছিলাম মাস চারেক আগে। স্পোর্টস, রাইফেল শুটিং বা ডিগ্রির সার্টিফিকেট কোনওটাতেই কাজ হচ্ছিল না। তখনই ডেভিলস বারের দোতলায় আলাপ হয়েছিল মানব সান্যালের সঙ্গে।

ডেভিলসের দোতলার চার নম্বর টেবিলটা ছিল আমার আর বীরেশদার ছোট্ট একটা পৃথিবী। হাজার ঝামেলা থাকলেও প্রতি বুধবার আমরা আমাদের ওই পৃথিবীটাতে